আঠারোর জ্বরে ও ঝড়ে

যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবে তুমি বাংলাদেশ

আলমগীর খান

'নিরাপদ সড়ক'-এর দাবি নিয়ে রাস্তায় এসে স্কুল শিক্ষার্থীরা সবাইকে চমকে দিয়েছে, সমাজে নতুন ভরসা তৈরি করেছে, অন্যদিকে শাসকদের আতংকিত করেছে। অসাধারণ অভিজ্ঞতায় মানুষ যখন উজ্জীবিত তখন শাসক সরকারের পুলিশ আর হেলমেট বাহিনী এই শিক্ষার্থীদের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিশোর বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি হয়েছে ভয়ংকর দাগ নিয়ে, কিন্তু তা যে সমাজকে বহুদিন শক্তি জুগিয়ে যাবে তা নি:সন্দেহ। এই সংখ্যায় বহুদিক থেকে আমরা এই বিদ্রোহকালকে দেখার চেষ্টা করেছি। এর ওপরই এই লেখা।

বাংলাদেশের মানুষ সহনশীল। না হলে ব্রিটিশ আমলে লাগাতার এত বড় বড় দুর্ভিক্ষ বাংলার মানুষ প্রায় মুখ বুজে সইত না। ইংরেজের হাতে বাংলার চরম লুণ্ঠন এমন নীরবে সংঘটিত হতে পারত না।[১] ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমল থেকেই সাধারণ মানুষ নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টের পেতে শুরু করে। সেদিন থেকেই মানুষ বুঝতে শুরু করে যে রাষ্ট্র ও শ্রমজীবী জনগণ আসলে দুই পক্ষ। এ কারণেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে মানুষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ক্লাইভের মর্মান্তিক যুদ্ধটাকে তামাশা মনে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেও সারা ব্রিটিশ আমলে ক্ষণে ক্ষণে বাংলার কৃষিজীবী মানুষ ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে এবং বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক কম্পাস নড়েছে বাংলার কেন্দ্র থেকে। কিন্তু একসময় বাংলার নেতৃত্ব ভারতীয় রাজনীতির ওপর থেকে এই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ভারত ভাগের সঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে বাংলাও। তবে পূর্ববঙ্গে স্বপ্নের পাকিস্তান আমলেও বিদ্রোহের আগুন নেভে না শুধু তা-ই না, আরও দিগবিস্তারী হয়ে জ্বলে ওঠে। ১৯৭১-এ পূর্ব বাংলার মানুষ পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের জন্য একটি স্বাধীন আসন ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু স্বাধীন দেশেও জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের নিরসন হয় না, বরং তা নতুন মাত্রা লাভ করে। রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে এটাই স্বাভাবিক।

একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে দুই ধরনের ঘটনা সমান্তরালে ঘটেছে। এক, গণ-আন্দোলন ও দুই, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র মূলত গণ-আন্দোলনেরই উল্টা পিঠ। কেননা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পারদ সব সময় গণ-আন্দোলনের বায়ুচাপ অনুসারেই ওঠানামা করে, তাকে থামিয়ে দেয়া বা ভিন্ন খাতে বইয়ে দেয়ার জন্য। গভীরভাবে লক্ষ করলে বাংলাদেশে সংঘটিত সব প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও খুনাখুনির পেছনে এই কারণটি চোখে পড়বে। কোন কোন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যদি আপাত একটা গণমুখী চেহারা থাকেও, তা মূলত মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য, আন্দোলনরত কর্মজীবী মানুষকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন করে তোলার জন্য। শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে যে শত্রুতা থাকে তা জনকল্যাণের জন্য নয়, নিজ স্বার্থে জনগণকে ব্যবহার করে জনরোষকে প্রশমনের জন্য।

> নিরাপদ সড়কের দাবিটি নিছক সড়ক দেখভালের সঙ্গে জড়িত নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক নাটবল্টু এর সঙ্গে জট পাকিয়ে আছে। ফুঁসে ওঠা এই শিশু-কিশোররা তা ঠিক ধরেছিল। তারা দেখিয়ে দিয়েছে সড়ক অব্যবস্থাপনায় পুলিশের দায়। এমনকি মন্ত্রীরাও যে সড়কের নিয়ম-কানুন মানেন না, তা কিশোর আন্দোলনকারীরা হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়েছে। আগেও এসব লোকজন জানত, তবে কেউ তাঁদের এভাবে ধরার সাহস পায়নি। হরহামেশাই মানুষ দেখেছে পুলিশের, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ও বিচারকদের গাড়ির চালকরা লাইসেন্স ছাড়াই দিব্যি গাড়ি চালাচ্ছেন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছাত্র আন্দোলনের মৌলিক দিক

ওপরে বর্ণিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশে একের পর এক আন্দোলন হয়েছে। আশির দশক থেকে শহুরে মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক যেসব চমক লাগানো আন্দোলন হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সফল ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের ঘটনা। প্রকৃত গণ-আন্দোলন থেকে এটি বেশ দূরের।[২] তবে রাষ্ট্রের শীর্ষ স্তরে এটি ক্ষমতার হাতবদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর দেখা গেছে গণজাগরণ মঞ্চের ঢেউ। কিছুদিন আগে হল কোটা সংস্কার আন্দোলন। আর সর্বশেষে সাম্প্রতিককালে তারুণ্যের উত্থান বা কিশোর বিদ্রোহ বা আঠারোর অভূতপূর্ব জাগরণ।

এখানে লক্ষণীয় যে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনটি ছিল নির্দলীয়, তবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আর শেষের দুটি আন্দোলনই অরাজনৈতিক এই অর্থে যে শাসনক্ষমতায় রদবদল বা নিছক পুনর্বণ্টনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। তবে রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত কোন ঘটনা যেমন অরাজনৈতিক হতে পারে না, এমনকি নির্দোষ প্রকৃতি ও প্রেমমূলক শিল্প-সাহিত্য চর্চাও, এ দুটি আন্দোলন তো নয়ই। বরং এ দুটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তিকে দেখা গেছে ভয়ানক রকমের সদাসতর্ক এবং এমনকি সাংঘর্ষিক অবস্থায়। বর্তমান আলোচনাটি সাম্প্রতিক সময়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক অভূতপূর্ব বিদ্রোহ, রাষ্ট্রকে নাড়িয়ে দেয়ার আশ্চর্য সুন্দর সাহসী ঘটনাটি নিয়ে।

সাম্প্রতিক কিশোর বিদ্রোহের গভীরতা ও ব্যাপ্তি

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই সহপাঠীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেও এর বীজ আরও গভীরে নিহিত। আর সে জন্য নিরাপদ সড়ক চেয়ে শুরু করা এই আন্দোলনটি সমগ্র রাষ্ট্রকে এক অবিস্মরণীয় ঝাঁকি দিয়ে গেল। আমাদের পরিবহন ও সড়ক ব্যবস্থাপনা চরম বিশৃঙ্খল, প্রতিবছর যা চার হাজারের বেশি মৃত্যু এবং প্রায় দশ হাজার মানুষকে আহত করার জন্য দায়ী।[৩] সড়ক দুর্ঘটনায় যে মৃত্যু তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরো ঠান্ডা মাথায় খুন, কেননা সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই মৃত্যু অনেক কমিয়ে আনা যায়। যেসব অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলা সড়কে বিদ্যমান তা দেখলেই বোঝা যায়, এ

হচ্ছে লুণ্ঠনের এক বাজার। অথচ সড়ক সবারই প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেককে এই লুণ্ঠনের বাজারে প্রবেশ করতে হয়। সে কারণে এই দুরবস্থার মাসুলও দিতে হয় প্রত্যেককে। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ দেন জীবন দিয়ে। যারা এই লুণ্ঠনের বাজার থেকে মুনাফা লোটে তারা এ ব্যাপারে নির্বিকার।

সড়ক ব্যবস্থার এই লুণ্ঠনের বাজারে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহায় শিশু-কিশোর ও নারীরা। প্রতিদিনই তাদের চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। দিতে হয় মৃত্যুর মত চরম মূল্যও। এমনই এক মর্মান্তিক মৃত্যুর মত ঘটনার পর একজন মন্ত্রীর নির্লজ্জ হাসি প্রতিদিনকার ক্ষোভের তুষে উত্তাপ মেখে দেয়। ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই এ অরাজকতার অবসান চায়। কেননা এই মৃত্যুর খড়গ প্রত্যেকের মাথার ওপরই ঝুলছে। সহপাঠীদের এই মৃত্যুতে তাই চরম ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তারা। তাদের সামান্য একটা দাবি–নিরাপদ সড়ক চাই। অথচ এই ছোট্ট দাবিটি দাবানলের মত হয়ে উঠল।

কারণ নিরাপদ সড়কের দাবিটি নিছক সড়ক দেখভালের সঙ্গে জড়িত নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক নাটবল্টু এর সঙ্গে জট পাকিয়ে আছে। ফুঁসে ওঠা এই শিশু-কিশোররা তা ঠিক ধরেছিল। তারা দেখিয়ে দিয়েছে সড়ক অব্যবস্থাপনায় পুলিশের দায়। এমনকি মন্ত্রীরাও যে সড়কের নিয়ম-কানুন মানেন না, তা কিশোর আন্দোলনকারীরা হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়েছে। আগেও এসব লোকজন জানত, তবে কেউ তাঁদের এভাবে ধরার সাহস পায়নি। হরহামেশাই মানুষ দেখেছে পুলিশের, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ও বিচারকদের গাড়ির চালকরা লাইসেন্স ছাড়াই দিব্যি গাড়ি চালাচ্ছেন। অথচ প্রতিদিনই রাস্তায় বহু গাড়ির চালক লাইসেন্স দেখাতে না পারায় এবং বিভিন্ন ছুতোনাতায় পুলিশকে ঘুষ দিচ্ছেন বা জরিমানা দিয়ে রেহাই পাচ্ছেন।

কেউ একজন হিসাব করে দেখিয়েছে যে ১৯৭১-এর অঙ্কগুলো যোগ করলে পাওয়া যায় ১৮। আর বাংলার সড়ক গেছে আঠারোর দখলে, তাই অনেকেই আবার চোখ বুলিয়েছে সুকান্তের 'আঠারো বছর' কবিতাটিতে। সামাজিক মাধ্যমে এসব ছড়িয়েও গেছে সর্বত্র।

একঝলক নৈতিকতায় সমুজ্জ্বল বাংলাদেশ

নিরাপদ সড়ক প্রশ্নটির যে গভীরতা ও ব্যাপকতা আছে তা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন স্লোগানে প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন–'রাষ্ট্রের মেরামত চলছে, সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত', '৯ টাকায় ১ জিবি চাই না, নিরাপদ সড়ক চাই', 'ছাত্রদের আপাতত রাস্তা সামলাতে দিন, মন্ত্রী পুলিশকে স্কুলে পাঠান শিক্ষিত করতে' ইত্যাদি। এসব স্লোগানে বৃহৎ সত্য ও করণীয় প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক স্লোগান ছিল আবেগ, মেধা ও কাব্যিক সৌন্দর্যে উজ্জ্বল, যেমন–'হয়নি বলে আর হবে না, আমরা বলি বাদ দে, লক্ষ তরুণ চেঁচিয়ে বলে পাপ সরাব, হাত দে', 'যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ, যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবে তুমি বাংলাদেশ' ইত্যাদি। আঁকা হয়েছে অনেক ছবি ও পোস্টার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করেই এই শিশু-কিশোররা আন্দোলন করেছে। একজন লিখেছে, 'শাহবাগে রাত-ভোর, স্মৃতিতে একাত্তর'। কেউ একজন হিসাব করে দেখিয়েছে যে ১৯৭১-এর অঙ্কগুলো যোগ করলে পাওয়া যায় ১৮। আর বাংলার সড়ক গেছে আঠারোর দখলে, তাই অনেকেই আবার চোখ বুলিয়েছে সুকান্তের 'আঠারো বছর' কবিতাটিতে। সামাজিক মাধ্যমে এসব ছড়িয়েও গেছে সর্বত্র।

এসব তরুণ-তরুণী অবাক করেছে মানুষকে, কীভাবে সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে। ট্রাফিক পুলিশকে তারা শিখিয়ে গেছে বিনা বেতনে ও বিনা প্রশিক্ষণেও তারা সুন্দরভাবে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারা যা দেখিয়ে গেল তা হচ্ছে, এ রকম যে কোন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সবার আগে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নৈতিক চেতনা, সততা ও দায়িত্বশীলতা। তাদের হাতে কোন বন্দুক বা লাঠি ছিল না, অথচ তারা এত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে। আর এত পুলিশ এত লাঠিসোঁটা নিয়েও এই যে অব্যবস্থা তার কারণ কী, তা তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অন্যদিকে মানুষ দেখল, পুলিশ নির্দয়ভাবে স্কুলের ছেলেমেয়েকে পেটাচ্ছে। কী করে সম্ভব? যেখানে কিনা সরকার স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করেছে। যেখানে শিক্ষককে প্রতিদিন ক্লাসে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সামলাতে হয়, অথচ তিনি তাদের কোন শাস্তি দিতে পারেন না, এবং আঘাত করলে শিক্ষকের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে, সেখানে পুলিশ কী করে স্কুলের ছেলেমেয়েদের এভাবে পেটায়? এ চিত্র সব শিক্ষক ও অভিভাবককে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে। এই ছাত্রছাত্রীরা তো কোন দাগি আসামি, ঘুষখোর, সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী–এসবের কিছুই না, আসলে তাদের সে বয়সই হয়নি। প্রশ্ন ওঠে, জনগণের পয়সায় পালা পুলিশকে কি যথেচ্ছ মানুষ পেটানো ছাড়া আর কিছুই শেখানো হয় না?

লক্ষণীয় যে রাস্তায় নেমে আসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভূমিকায় নামা এই শিশু-কিশোররা কারও সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেনি। তারা যতটা সম্ভব শালীনতার সঙ্গে তাদের কাজ করেছে। তারা যেন দেশের কর্মকর্তাদের হাতে-কলমে শেখানোর জন্য কিছু সময় শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের কারণে রাস্তাঘাটে মানুষের ভোগান্তির শেষ ছিল না, অথচ সবাই খুশি হয়েছে। কোন মানুষ তাদের আচরণে বিরক্ত হয়নি, যেন তাদের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ ছিল সবার চোখে-মুখে। সবার মনে ছিল নিরাপত্তাবোধ আর চোখে-মুখে ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে নীরব গর্ব। নিজেদের প্রজন্মের ব্যর্থতার গানি থেকে যেন প্রত্যেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেয়েছে। যেন সবার তৃপ্তি হয়েছে, বহুদিন পর নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে জেতা সোনার বাংলাকে মনের মত সুন্দর করে গড়ার একটা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

এই শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণীর হাতে পোস্টার দেখা গেছে, যাতে লেখা 'বাবা, তোমার আয়ের উৎস কী জানতে চাই'। এই ছেলেমেয়েরা নৈতিকতার প্রশ্নে বাপকেও ছাড়বে না প্রতিজ্ঞা করেছে। এমন ছেলেমেয়ে নিয়ে গর্ব হবে না কোন মা-বাবার? এমনকি দুর্নীতিগ্রস্ত বাবাও চায় যে তার ছেলেমেয়ে নৈতিকভাবে সুন্দর মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক। আর যে ছেলেমেয়ে নৈতিকতার প্রশ্নে তার মা-বাবাকেও ছাড়বে না, তারা যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এবং এমনকি রাষ্ট্রের হর্তাকর্তাদেরও ছাড় দেবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই জ্বলে ওঠা প্রজন্ম যে বর্তমান সমাজের মৌলিক সংকট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তা বোঝা যাচ্ছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে আমূল পরিবর্তনসমূহ প্রয়োজন তা তারা বোঝে, আর সেই পরিবর্তনের জন্য তারা প্রস্তুত। শুরুটা তারা ঘর থেকেই করতে চায়।

তাই বলে বাবার আয়ের উৎস সম্পর্কে এমন উদ্ধত প্রশ্নের জন্য কোন অভিভাবক তাঁদের সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দেননি বা তাদের কোনো শাস্তিও দিতে যাননি। কারণ এমন সন্তান মা-বাবার

কাছে যে সত্যিকার গর্বের। তবে রাষ্ট্র কেন তটস্থ? শাসকগোষ্ঠী কেন গর্বিত নয়? ঘরে মা-বাবার মত রাষ্ট্র ও সমাজের অভিভাবকদেরও গর্বিত হওয়া উচিত প্রতিবাদে ও নৈতিকতায় সমুজ্জ্বল এই তারুণ্যময় বাংলাদেশকে একঝলক দেখে।

শাসকগোষ্ঠীর সংকোচ

এই যে আজকের ছেলেমেয়ে কদিন রাস্তায় নেমে বুড়োদের দেখিয়ে গেল কিভাবে রাষ্ট্রের যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক রাখতে হয় এবং সঠিকভাবে চালাতে হয়, শিখিয়ে গেল পুলিশকে, গাড়িওয়ালাদের, মন্ত্রীদের, বিচারকদের আর সমস্ত সাধারণ মানুষকে। এই তারুণ্যের উত্থান কী করে সম্ভব হল, তা ভাববার বিষয়। আমাদের বহুল সমালোচিত শিক্ষাব্যবস্থাও এ জন্য কোন কৃতিত্ব পেতে পারে কি না ভেবে দেখা যায়। যদিও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মুখ চুপসে গেল, তারাও কোন কৃতিত্ব চাইতে শরম পেল।

রাষ্ট্রের কর্ণধাররা খেপলেন, কারণ ছাত্ররা বলেছে তারা ৯ টাকায় ১ জিবি চায় না, চায় কেবল বই-খাতা-কলম। অনেকে যে মনে করেন, ১ জিবির সাথে সাথে খাল কেটে কুমির আনা হচ্ছে, তা মোটেও ভিত্তিহীন নয়। কর্তাদের ধারণা ছিল করপোরেট বদান্যতায় খুশিতে নাচতে নাচতে বরং ছাত্ররা ১ টাকায় ৯ জিবির আবদার করবে। হল উল্টা। এরা ডিজিটাল ব্যাপারটা বুঝলই না। ছাত্ররা রাস্তা সামলাবে আর মন্ত্রী ও পুলিশরা ইশকুলে যাবে, রাষ্ট্রের হর্তকর্তারা তা স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে পারেন না। পুলিশ ভাইয়েরা তাই লাঠি ও বন্দুক নিয়ে স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়লেন!

এই ছেলেমেয়েরা নতুন চেতনার জ্বরে জাতিকে কাঁপাল। আমাদের রাস্তাঘাটে দেয়া এত দিনকার সব ম্যাড়মেড়ে বাসি স্লোগান মুহূর্তে অচল হয়ে গেল। 'আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে'–বিদ্রোহী কবি নজরুলের এই কবিতাটি নিছকই শিশুর আনন্দের জন্য, বড়জোর তার ঘুম ভাঙানোর জন্য। কিন্তু এই ছেলেমেয়েরা নজরুলের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটির ধারেকাছে না গিয়ে একেবারেই একটা মেয়ে-ছেলে ভোলানো ছড়াকে প্রতিবাদ ও মিছিলের মাঝে টেনে আনল। সাহিত্যেরই যে ল্যাবরেটরি এই ছেলেমেয়েরা খুলে দেখাল তাতে সাহিত্য ও জীবনের ওতপ্রোত সম্পর্কটি আরেকবার অতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাংলাদেশের মানুষ এই প্রথমবারের মত চমকে উঠল নজরুলের 'ভোর হল দোর খোল' ছড়াটির এই অভূতপূর্ব মানে জেনে।

রাষ্ট্রের কর্ণধারদের তাই বেশ উদ্বিগ্ন দেখা গেছে। কারণ এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই নবপ্রজন্ম ক্ষমতার ভেতরের ও বাইরের বর্তমান সব মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাদের ব্যর্থ মনে করছে। নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য তৈরি হচ্ছে তারা। এই আন্দোলনের ফসল এখনও কোন দুর্বৃত্ত নিতে পারেনি। সেই ভয়টিই তৈরি হয়েছিল যখন নানা পক্ষের ও শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছিল এর মধ্যে। কেউ কেউ তাদের খলনায়ক এবং কেউ কেউ অতিনায়ক বানানোর চেষ্টা করছিল। ফায়দা লোটার চেষ্টা হচ্ছিল নানা পাশ থেকে। ব্যাপক আশান্বিত হয়েও তাই আবুল কাসেম ফজলুল হক ঠিকই লিখেছিলেন, "ইতিহাস বলে যে তরুণদের সমস্যাভিত্তিক এইসব আন্দোলনকে হীনস্বার্থান্বেষীরা তাদের দখলে নিয়ে নেয় এবং তা দ্বারা তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়।"[৪]

খাঁচায় তোতা পাখির স্থানে বাঘের বাচ্চা পাওয়ার রহস্য

আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোতা পাখিকে উচিত শিক্ষা দেয়ার উপযোগী করেই সাজানো। শিক্ষার নামে তোতা পাখিটি মেরে ফেলার পর "রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না।"[৫] লর্ড মেকলে প্রবর্তিত আমাদের চলতি শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর পাখিমনটিকে একইভাবে মৃতপ্রায় নির্জীব করে ফেলার সব আয়োজন পাকাপাকি করা আছে।

অতএব, দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু নিশ্চয়ই এই অনন্য ব্যবস্থার ফাঁকে একটা কোন বড় ত্রুটি ঢুকে গেছে। সুবোধ তোতা পাখিটি মরে গিয়ে যেখানে শিক্ষার জয়গান প্রচার করবে, সেখানে খাঁচার মধ্যে তোতা পাখিটিই দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্য, পাখিটি মরেনি! সেখানে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, তোতা পাখি নয়, অন্য কী। বেঙ্গল টাইগার? উত্তর ভবিষ্যতের কাছে। আমরা আশাবাদী।

আশাবাদী যে নতুন প্রজন্ম আসছে নতুন দাবি ও যোগ্যতা নিয়ে। এখনকার রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসন ব্যবস্থা যে তাদের ধারণ করতে সক্ষম নয়, তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তারা ইতোমধ্যে টাটা দিয়েছে বর্তমানের ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন উভয় শাসকগোষ্ঠীকে। এই নতুন প্রজন্মকে এবারও কেউ 'দাবায়ে' রাখতে পারবে না।[৬] আহা! আমাদের কানে অনুরণিত সেই একাত্তরের দেহমন মাতানো মোহন মূর্ছনা।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, শিক্ষালোক।
ইমেইল: alamgirhkhan@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১। Kazi A B M Iqbal, The Zamindary Abolition Movement in Bengal, আড়িয়াল মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১২
২। আবুল কাসেম ফজলুল হক, রাজনীতিই হওয়া উচিত মূল চালিকাশক্তি, ভোরের কাগজ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৩। NCPSRR: Road accidents killed 4,284 people in 2017, Dhaka Tribune, January 1st, 2018
৪। পূর্বোক্ত
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তোতা-কাহিনী, রবীন্দ্র রচনাবলি
৬। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে

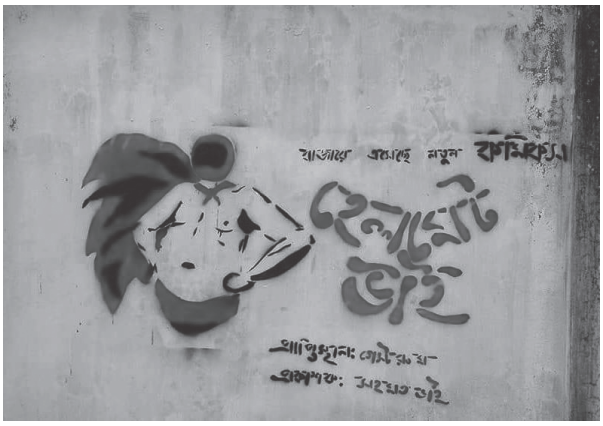

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের দেয়ালে অচেনা আঁকিয়েদের করা গ্রাফিতি। এতে লেখা 'বাজারে এসেছে নতুন কমিকস্ হেলমেট ভাই। প্রাপ্তিস্থান: গেস্ট রুম, প্রকাশক: সহমত ভাই'